Webinar : “আমফান ঝড়ের পরে সুন্দরবন পুনর্গঠনের পরামর্শ”_ একটি প্রতিবেদন

২৪.০৬.২০২০

ভুমিকাঃ

করোনা ভাইরাসের জন্য দেশ জুড়ে যে লকডাউন চলছে, তাতে গ্রামের মানুষের জীবন ও জীবিকা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষবাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষজনের রোজগার কমে যাচ্ছে। এরপর, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এল ভয়ঙ্কর ঝড়, আমফান গত ২০শে মে, ২০২০ তারিখে। ঝড়টি ঘন্টায় ১৮৫ কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে প্রায় ৯ ঘন্টা ধরে, প্রবল তান্ডব চালিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় ৬টি জেলার ওপর। এরফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোথাও নদী বাঁধ ভেঙ্গে লবণ জল ঢুকে, ফসলের ক্ষতি হয়েছে, পুকুরের মাছ মারা গেছে, মাটির বাড়ি ধসে গেছে। আবার কোথাও টালি, টিন, অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি বাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এছাড়া প্রচুর বড় গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি ইত্যাদি পড়ার ফলে, মানুষ ও পশুপাখির ঘরবাড়ী, দোকান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রাস্তাঘাটের যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়।

ঝড়টি সমুদ্র তট পেরিয়ে, স্থলভাগের সাগর বদ্বীপের ওপরে প্রথমে আছড়ে পড়ে। এরপর দুই ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি করতে করতে কলকাতার দিকে ধেয়ে আসে। এরপর ধ্বংসলীলা চালায় দুই মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। এটি সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে, সাগর সহ হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, মিনাখা ও সন্দেশখালি ব্লকে। এইসব এলাকার হাজার হাজার মাটির বাড়ি ধসে গেছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ ও দুরাভাষের সাহায্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নদী বাঁধ ভেঙ্গে লবণ জল ঢুকেছে বহু এলাকায়। কেউ কেউ ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে রাস্তায় কিম্বা অন্য কোন সরকারী আশ্রয়স্থলে। মানুষের ভোগান্তির কোন সীমা ছিল না। কারও কারও মাঠে পাকা ফসল ছিল, যা এই ঝড়ে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে মৎস চাষি ও জেলেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারও মাছ পালিয়ে গেছে, কারও লবণ জল পেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কারও মাছ ধরার জাল ঝড়ে উড়ে গেছে, কারও মাছ ধরার নৌকো ভেঙ্গে গেছে।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের জিপ্লট এলাকায় ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী বাঁচার জন্য ভিন রাজ্য থেকে আসা লোকেদের জন্য তৈরি কোয়ারিন্টিন সেন্টারের তালা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে। কোথাও যেন এই ঝড় মানুষকে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতাও ভুলিয়ে দিয়েছিল।

শুধু প্রত্যন্ত গ্রাম নয়, কলকাতায়ও এর প্রকোপ থেকে রেহাই পায়নি। অনেক বড় গাছ উপড়ে পড়েছে, বৈদ্যুতিক স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে অনেক ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বাস ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছে। কয়েকদিনের জন্য মহানগরী বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, গঙ্গার জল উপচে পড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যঃ

করোনা অতিমারি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমনঃ বুলবুল, আমফান ইত্যাদি) ফলে মানুষের খাদ্য, পানীয় ও জীবিকাতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তা এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে মানিয়ে নিতে পারে এমন ব্যবস্থাপনার দ্বারা সমাধানের উপায় বের করা।

প্রোগ্রামের মূল Resource Person দের নামঃ

- **অর্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জি**, President, DRCSC (**চাষবাস বিষয়ক** Resource Person)
- **ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়**, Retired Principal Scientist, ICAR-CIFA (**মৎসচাষ বিষয়ক** Resource Person)

- **ড. কৃষ্ণা রায়, Professor, WBSU (বাদাবন ও অন্যান্য উদ্ভিদের ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য Resource Person)**
- **সৈকত পাল, Development Professional, Prasari (সুন্দরবন পুনর্গঠনে সহায়ক সরকারি সুযোগসুবিধা পর্যালোচনার জন্য Resource Person)**
- **অংশুমান দাস, Developmental Professional (সঞ্চালক)**

প্রাথমিক বার্তাঃ

অংশুমান দাস, যিনি এই প্রোগ্রামের সঞ্চালক ছিলেন, প্রথমে Resource Persons এবং অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু করেন। এরপর তিনি করোনা এবং আমফান ঝড়ের জন্য সুন্দরবনের বিধ্বংসী অবস্থার কথা তুলে ধরেন। তিনি এও বলেন, তাঁদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এসেছে ত্রান নিয়ে। এদিনের প্রোগ্রামটির মূল লক্ষ্য হল, ঝড়ে বিধ্বস্থ মানুষদের জন্য বাস্তুতন্ত্র ও জীবন-জীবিকাকে পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা।

এরপর একটি ছোটো ভিডিও-র মাধ্যমে, কীভাবে আমফানের প্রভাবে সুন্দরবনবাসির জীবন ও জীবিকা রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, তা তুলে ধরা হয়। তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গেছে এবং নদী বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢুকে ফসল, সবজি, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ চাষের খুব ক্ষতি হয়েছে। তাদের কাছে খাবার নেই, অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। ফলে সাধারণ জনজীবন গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।

উক্ত এলাকার কর্মীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনঃ

এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে, দেবব্রত গুচ্ছাইত যিনি DRCSC, রামগঙ্গা অফিসের একজন কর্মী, আমফান পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের চিত্রটি নিজের কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি জানান, এই ব্লকের ৯৮টি গ্রামই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ২৫টি গ্রামে একটু বেশী ধ্বংসলীলা চোখে পড়েছে। এই ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই লবন জল ঢুকেছে, কোথাও নদী বাঁধ ভেঙ্গে, কোথাও বা বাঁধ উপচে। ৭০০০-৮০০০ টি পরিবার এই লবণ জল প্লাবনের শিকার। লবন জলে প্লাবিত এলাকাগুলিতে, প্রায় ২ সপ্তাহের বেশি জল জমে ছিল। এখন সরকারি প্রচেষ্টায় নদী বাঁধগুলি মেরামতের কাজ চলছে। আমন ধানের চাষ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যে জায়গাগুলিতে লবণ জল ঢুকেছিল, সেখানে জমিগুলির

ওপরের মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেলে তারপর কম্পোস্ট ও খোল দিয়ে মাটি প্রস্তত করতে হবে। তারপর লবণ সহনশীল ধান এখানে চাষ করা যাবে। তিনি এও জানান, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও কতকগুলি প্রজাতির সবজি বেঁচে ছিল, সেগুলি হল পুঁই, লাউ, নটে, কুঁদরি ইত্যাদি।

এবার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ছবি তুলে ধরেন, DRCSC, হিঙ্গলগঞ্জের কর্মী, তপন মন্ডল। তিনি বলেন যে, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ১০-১২টি গ্রাম, লবন জলে প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩-৪টি গ্রামে নতুন বাঁধ করা সম্ভব হয়েছে, বাকি গ্রামগুলিতে এখন বাঁধ বাঁধার কাজ চলছে। ঝড়ের একমাস পরেও এই জায়গাগুলিতে জল জমে রয়েছে। এখানেও হয় নদী বাঁধ টপকে কিম্বা বাঁধ ভেঙ্গে, জল ঢুকেছে। কিছু কিছু পরিবার, এখনও বাঁধের ওপর তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছে। তপনবাবু জানান, নদী বাঁধগুলি ভাঙ্গার মুল কারণ হল, এগুলি মাটির বাঁধ ছিল এবং ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়ে সরু হয়ে গিয়েছিল। যারফলে তীব্র ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাত সইতে না পেরে ভেঙ্গে গেছে। তিনি এও জানান যে, যে গ্রামগুলিতে নদী বাঁধ বাঁধা হয়ে গিয়েছে, সেগুলিতে বৃষ্টির জলে ধুয়ে কিছুটা লবণ কমেছে এবং মাটি চাষের উপযুক্ত হয়েছে। এখানকার চাষিরা লবনসহনশীল ধান, যেমন দুধেশ্বর, রাঁধুনি পাগল, পাটনাই ইত্যাদি চাষ করার জন্য বীজ তলা তৈরি করেছেন। কিন্তু যে জায়গাগুলিতে এখন লবণ জল জমে রয়েছে, ওখানে কিছুই চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

- **কর্মীদের কথা থেকে উঠে আসা সমাধান সুত্রঃ**
  - ✓ লবণ জলে প্লাবিত এলাকাগুলিতে, বৃষ্টির জলে উপরের লবণ ধুয়ে গেলে ওই মাটিতে কম্পোস্ট ও খোল মেশাতে হবে। এরফলে মাটির লবণ কমে গিয়ে চাষের উপযোগী হবে।
  - ✓ অধিক লবণ সহনশীল কিছু শাক-সব্জির উদাহরণ হল – পুঁই, লাউ, নটে, কুঁদরি ইত্যাদি।
  - ✓ প্লাবিত এলাকায় কিছু লবণ সহনশীল ধান চাষ করা যায়। যেমন – দুধেশ্বর, রাঁধুনি পাগল, পাটনাই ইত্যাদি।

আলোচনার বিষয়বস্তুঃ

চাষবাসঃ

DRCSC সংস্থার President অর্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জি এই পরিস্থিতে চাষবাসে কি পরিবর্তন আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন।

- **জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবঃ** অর্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জি, প্রথমে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার ফলে ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা, সবাইকে মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, পূর্বে ১০-১২ বছর অন্তর কোন বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হত সুন্দরবনবাসী, কিন্তু এখন প্রায়ই বড় বড় দুর্যোগ চোখে পড়ছে। তিনি এও বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলের লবনাক্ততা ও অম্লত্ব দুই বাড়ছে, ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে। এর প্রভাব পড়ছে জলজ প্রাণী ও বাদাবনের ওপর। বাদাবনে থাকা গাছের প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে এবং অনেক প্রজাতিও হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নালাগুলিতে পলি জমে যাওয়ায়, এদের বহন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং আশেপাশের লোকালয় ও বাদাবন প্লাবিত হচ্ছে এবং কোন কোন সময় নদী গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

- **সঠিক প্রজাতি নির্বাচনঃ** চাষবাসের সমাধান হিসাবে অর্ধেন্দুবাবু বলেন, এখন শুধু লবন সহনশীল নয়, এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা ও জলজমা সহ্যকারি ফসলও বাছতে হবে। এরকম কিছু লবন, খরা ও জলজমা সহ্যকারি শাক হল – পুঁই, নটে, মিঠা ও তিতা পাট, কাটোয়া ডাঁটা, কলমি, রাঙালু শাক ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু সবজি, যেমন বেগুন, ভেন্ডি ইত্যাদি রয়েছে। এক্ষেত্রে এদের কোন্ নির্দিষ্ট প্রজাতিগুলি লবন, খরা ও জলজমা সহ্য করতে পারে, তার নির্বাচন করা দরকার।

- **চাষ পদ্ধতিঃ**

✓ এরপর তিনি এগুলি চাষ করার পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। যেখানে মাটি এতটাই লবনাক্ত যে মাটিতে চাষ করা সম্ভব নয়, সেখানে বস্তায়, উঁচু করা কোন পাত্রে কিম্বা ঝুলন্ত কোন পাত্রে ভাল মাটি এনে ও তার সঙ্গে কিছু কম্পোস্ট মিশিয়ে চাষ করার কথা বলেন। উদাহরণ হিসাবে বলেছেন, যেমন বাজার থেকে রাঙালু কিনে, জুতোর বাক্সে মাটি দিয়ে বসিয়ে দিলে, সেখান থেকে কয়েকদিন পরেই অঙ্কুর গজাবে এবং প্রতিটি অঙ্কুর কেটে বিভিন্ন পাত্রে বসিয়ে চাষ করা সম্ভব হবে।

✓ এছাড়াও যেখানে নোনাজল জমে আছে, সেখানে জলের ওপর মাচা করে লতানো গাছ চড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে গাছের গুঁড়িগুলি উঁচু জায়গায় কোন পাত্রে বা বস্তায় রাখতে হবে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, গ্রামে গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে মাটির ম্যাচলা থাকে তার মধ্যে মাটি ও কম্পোস্ট দিয়ে পুঁই, কুমড়ো, রাঙ্গালু ইত্যাদির চাষ করা যায়। তারপর সেগুলিকে ৩০ ফুট X ৩০ ফুটের একটি মাচা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

✓ এছাড়া মফস্বল এলাকার জন্য, তিনি টায়ার এর ওপর টায়ার রেখে, ওর মধ্যে মাটি দিয়ে চাষ করার কথা বলেন।

- **মাটি তৈরির পদ্ধতিঃ** এরপর অর্ধেন্দুবাবু যেখানে লবণজল এসে, এখন নেমে গেছে সেখানকার জন্য মাটি তৈরির পদ্ধতিগুলি জানান। প্রথমে বলেন উঁচু করে, বেড করে চাষ করার কথা। আর এই বেডের মাটিতে কাঠকয়লার গুঁড়ো, গেঁড়ি-গুগলি পুড়িয়ে করা চুন কিম্বা বাজার থেকে কিনে আনা রক ফসফেট দিয়ে মাটি তৈরির কথা বলেন। তিনি বলেন যে, মাটির জৈববস্তুর পরিমাণ বাড়লে, তবেই মাটির লবনাক্ততা কমবে, ড্রেনেজ ক্ষমতা ভাল হবে এবং তাড়াতাড়ি চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন যে, সুন্দরবন এলাকার মাটিতে কাদার ভাগ বেশী হওয়ায় এর ড্রেনেজ ক্ষমতা খুবই খারাপ। ফলে জল ওপরের তলায় জমা হয়ে থাকে এবং নীচের দিকের স্তরে যেতে পারে না।

- **সার প্রয়োগঃ** এছাড়াও তিনি গাছের ওপর জিবামৃত, তরলসার ইত্যাদি ছড়িয়ে তাদের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর কথা বলেছেন। প্রয়োজনে মাটিতে জীবাণু সার প্রয়োগের কথাও বলেন। নিম ও করঞ্জের খোল পচিয়ে মাঝে মধ্যে গাছের ওপর প্রয়োগ করতে বলেছেন। এতে গাছের রোগ-পোকার আক্রমণ কমে।

- **গাছ লাগানঃ** আমফান ঝড়ে প্রচুর গাছ নষ্ট হয়েছে, আবার লবণ জল ঢুকে যাওয়ায় ঘাস মরে গেছে, ফলে গোখাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। তাই তিনি কিছু গাছ লাগানোর কথা বলেন যেগুলি লবন সহনশীল হবে, তাড়াতাড়ি বাড়বে এবং পশু খাদ্যেরও জোগান দেবে। যেমন- বাবলা, হাবল, তুঁত ইত্যাদি। তুঁত গাছের সুবিধা হল, এর ডাল কেটে পুঁতে দিলেই নতুন গাছ হয়ে যায়, আর এটি শুধু গোখাদ্য নয়, মুরগীরও একটি উপাদেয় খাদ্য।

- **ধান চাষের জন্য সাবধানতা গ্রহনঃ** এরপর ধান চাষের কথা বলতে গিয়ে অর্ধেন্দুবাবু বলেন, প্রথমে জলে লবণ গুলে লবণের ঘনত্ব এমন করতে হবে যেন একটি কাঁচা ডিম ভাসতে পারে। এবার ওই লবন জলে ধান বীজ ফেলে বীজ বাছাই করতে হবে, যে বীজগুলি জলের উপরে ভেসে উঠবে, সেগুলি পুষ্ট নয়, সেগুলিকে ফেলে দিতে হবে। অন্যদিকে যেগুলি জলে ডুবে যাবে, সেগুলিকে ছেঁকে নিয়ে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর সেগুলিকে গোমূত্র দিয়ে শোধন করতে হবে। এরপর মাটিতে চুন ছড়িয়ে মাটি প্রস্তুত করে, বীজতলা তৈরি করার কথা বলেন। এছাড়া বার্ড পার্চার করে কিম্বা পোকা খেতে পারে, এমন মাছ যেমন শিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদি চাষ করে, ধানের পোকা নিয়ন্ত্রন করার কথা বলেন।

- **চাষের স্থায়ী সমাধানঃ** তিনি বারবার করে স্থায়ী ব্যবস্থাপনা গ্রহনের কথা বলেছেন। কারণ প্রত্যেক বার ঝড়ের সময় ছুটে গিয়ে সাহায্য করা, আসলে টাকা ও শক্তি ২টির ই অপচয় করা। এর উপায় হিসাবে তিনি বলেন, ১-২ বিঘা জায়গায় এই পদ্ধতি অবলম্বন না করে, ৭-৮ একর জায়গা জুড়ে যদি জৈব ও সুসমন্বিত চাষের মডেল তৈরি করা যায় তবে সেটি স্থায়ী হবে। যেহেতু সুন্দরবনে বেশিরভাগই ছোটো ও প্রান্তিক চাষির বাস, তাই চাষিদের দল গড়ে এই মডেল তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ওই চাষিদের ঘর পাশাপাশি না হলেও চলবে কিন্তু ওদের জমিগুলি পাশাপাশি থাকা দরকার।

- **পুকুর পাড়ের ব্যবস্থাপনাঃ** তিনি পুকুর পাড়ে সেইসব গাছ লাগানোর কথা বলেন, যেগুলি বর্তমান ও আগামী দিনের জন্য পুকুর পাড়কে ধরে রাখতে ও মাছ চাষ করতে সাহায্য করবে। আবার গাছগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্বও থাকা দরকার। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, লেমন ঘাস চাষ করলে সেটি পাড়কে শক্ত ভাবে ধরে থাকে এবং

এর পাতা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়, এই পাতা নিজেরাও ব্যবহার করতে পারেন এবং বাজারে বিক্রিও করা যায়। এছাড়া হাবল, জিওল, নোড়ফল ইত্যাদি গাছ পুকুর পাড়ে লাগানোর কথা বলেন।

- **দুর্যোগ মোকাবিলার স্থায়ী সমাধানঃ** তিনি এও বলেন, আমাদের এবার সুদূরপ্রসারী কোন পথ বের করতে হবে, যা দিয়ে বুলবুল, আমফানের মতো প্রতিনিয়ত ঘটে চলা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মোকাবিলা করা যাবে। এর উপায় হিসাবে তিনি একটি প্রস্তাব রাখেন, সেটি হল এলাকায় যাঁরা অভিজ্ঞ চাষি আছেন, তাঁদের থেকে কোন্ গাছ কিম্বা কোন্ ফসলের কোন্ জাতটি দুর্যোগের পর বেঁচে থাকছে, তার বিশদ তথ্য নিতে হবে। এরসঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা যে সব উপায়ের কথা বেলেছেন সেগুলিও জোগাড় করতে হবে। এরপর সেগুলিকে যেসব এলাকায় বেশী দুর্যোগ দেখা যায়, সেখানে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি বানিয়ে, সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। যাতে ওই এলাকার মানুষ, যখন প্রয়োজন হবে, তখন যেন এই সব জ্ঞান পেতে পারেন। এইভাবে এলাকার মানুষের থেকে জ্ঞান নেওয়া ওঁদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দুর্যোগকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। তিনি আশা রাখেন, তখন আর বারে বারে ত্রান নিয়ে দৌড়াতে হবে না, এলাকার মানুষ নিজেরাই এর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন।

মাছচাষঃ

ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, যিনি ICAR-CIFA র একজন প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক, লবন জল জমে থাকা পুকুরে মাছ চাষের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

- **মাছের প্রজাতি নির্বাচনঃ** লবণ জল ঢুকে পড়েছে এমন পুকুরে, তিনি গতানুগতিক রুই, কাতলা, মৃগেল চাষ ছেড়ে বাটা, পায়রা চাঁদা, নোনা ট্যাংরা, মুক্তগাছা, উন্নত প্রজাতির তেলাপিয়া, দেশী মাগুর-শিঙ্গি, সিলভার কার্প প্রভৃতি চাষ করার কথা বলেন। এই মাছগুলি অল্প সময়ে ও ব্যয়ে বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে ওঠে। বিশেষ তদারকি ও পরিচর্য্যারও প্রয়োজন পড়ে না। এগুলি সবকটি সর্বভুক এমনকি জৈববর্জ্যও। তিন-চার মাসের মধ্যে ১৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে যেতে পারে আর অধিক ঘনত্বে টিকে থাকার ক্ষমতা রাখে। এমনকি এদের লবণ সহনশীলতাও লক্ষ্য করা যায়।

- **মাছের পোনা সংগ্রহ করার উপায়ঃ** এগুলি সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর রয়েছে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জন্য এর দুটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র – একটি নিমপিঠে ও আরেকটি আড়াপাচেঁ (সোনারপুরের কাছে) আর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জন্য অশোক নগরে একটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক ব্লকে আছেন- মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক ও মৎস্য সহায়ক আধিকারিক। সোনারপুরের একজন অভিজ্ঞ মৎস্য চাষি, সুকল্যান মন্ডলের কাছ থেকেও চাষি পোনা সংগ্রহ করতে পারে। (ফোন নং- ৯৬৭৪৪১৫২৩৯) বিঘা প্রতি জলাশয়ে মোট ১০০০টি করে চারাপোনা ছাড়া যেতেই পারে। কিছু বেশী হলেও কোন অসুবিধে নেই।

- **নতুন চাষ মানিয়ে নেওয়ার উপায়ঃ** যদি নতুন মাছ চাষে, চাষিরা ভরসা না পান, তবে পুকুরের ছোটো অংশে নেট ঘিরে কিম্বা বাঁশের খাঁচা বানিয়ে আলাদাভাবে চাষ করার কথা বলেন।

- **পুকুরে মাছ ছাড়ার আগে জলের প্রস্তুতিঃ** মাছ ছাড়ার আগে জলের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ সাইক্লোনের পরে, পুকুরের জলের গুনগত মান খারাপ হয়ে গেছে। নিকটবর্তী কোন ওষুধের দোকান থেকে ২০-২৫ টাকা দিয়ে pH পেপার কিনে পরীক্ষা করে নেওয়া যেতে পারে। জলের pH ৭.৫ হলে সেটি মাছ চাষের উপযুক্ত। যদি এর চেয়ে কম থাকে, চুন প্রয়োগ করে বাড়িয়ে নেওয়া যায় (তবে বিঘা প্রতি ২০ কেজির বেশী নয়)। আর এর চেয়ে বেশী থাকলে, pH কমাতে তেঁতুল বা আমড়া গাছের ডালপালা পুকুরে ফেলে দুদিন রেখে দিলে হবে। যদি এতেও না কমে, তবে কিছু তেঁতুল কাপড়ে বেঁধে লাঠির ডগায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আর পুকুর যদি পানায় ভর্তি থাকে, তবে খড়ের দড়ি বানিয়ে টানা

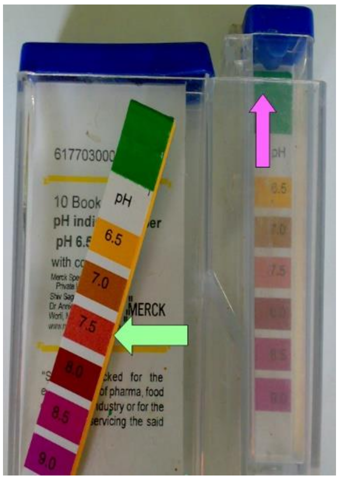

দিয়ে, পুকুরের এক প্রান্তে এনে সহজেই তুলে ফেলা সম্ভব। পুকুরে পানা থাকলে সূর্যালোক জলে ঠিক মতো পড়ে না ও মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাছ ছাড়ার আগে অল্প জলে ওগুলিকে সইয়ে নিয়ে ছাড়লে, কোন পোনা মরে না।

- **মাছের খাদ্য তৈরির উপায়ঃ** মাছের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ৫০০ গ্রাম গুঁড়ো বাদাম খোল, ৫০০ গ্রাম সেদ্ধ করা চালের খুদ, ১০০ গ্রাম চিটে গুড় ও এক চিমটে খাবার লবণ দিয়ে মণ্ড তৈরি করে, একটি কলসিতে ১০ লিটার জল নিয়ে তাতে এই মণ্ডটি ফেলে দিতে হবে ও মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। রোজ একবার করে একটি দণ্ড নিয়ে ঘেঁটে দিতে হবে এবং তিনদিনে জৈব জুস তৈরি হয়ে যাবে। এরপর ১০-১২টি পরিত্যক্ত বোতলে তরলটি ভরে, ছিপিতে কয়েকটি ছিদ্র করে, বোতলটি উল্টো করে দণ্ডের সাহায্যে পুকুরের বিভিন্ন প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে প্রাকৃতিক খাদ্যকনা তৈরি হবে সহজে। এই খাদ্যকনা আরও ভালোভাবে জন্মাতে পারে, যদি জলে পচানো গোবর ছড়ানো যায়। মাঝে মাঝে আখের ছিবড়ে কঞ্চিতে জড়িয়ে পুঁতে রাখলেও প্রাকৃতিক খাদ্যকনা পর্যাপ্ত পরিমাণ জন্মাতে পারে ও চাষি প্রায় নিখরচায় মাছের বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি মাসে একবার জাল টানা যায়, তবে মাছের বৃদ্ধি ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তা জানা যায়। যদি তাতেও না হয়, তবে চিড়ের গুঁড়ো বা গোটা ধানের গুঁড়ো সঙ্গে সরষের খোল ও কিঞ্চিত মেথির গুঁড়ো মিশিয়ে গরম জলের সাহায্য বল তৈরি করে মাছকে খাবার দেওয়া যেতে পারে। তবে এই খাবারের জন্য কিছুটা পুঁজির দরকার হয়। মাছের সাথে চিঁড়ি চাষ করলে উপার্জন আরও বাড়তে পারে।

- **জিওল মাছের চাষঃ** তিনি বলেন, ছোটো ডোবা কেটে, অল্প গভীরতা যুক্ত জলে জিওল মাছ চাষ করা যায়। তবে সরাসরি পুকুরে করার চেয়ে স্বল্প মূল্যের বাঁশের খাঁচা এই চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ পুকুরে সরাসরি এই মাছ চাষ করলে, সব মাছ পুরোপুরি তোলা সম্ভব হয় না। কিছু মাছ কাদার মধ্যে থেকে যায়, কিছু মাছ পালিয়েও যেতে পারে। অন্যদিকে খাঁচায় করলে, সব মাছ একসঙ্গে তুলে আনা সম্ভব। জিওল মাছকে ওই পুকুরেই যে গেঁড়ি গুগলি পাওয়া যায়, তাই ভেঙ্গে খেতে দিলেই হয়, বাইরে থেকে খাবার কিনে খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না। তাই এই মাছ চাষের খরচ কম। এই মাছের বৃদ্ধির হার বেশী না হলেও ছোটো মাছের ভালো দাম পাওয়া যায়। তিনমাসে মাছের গড় ওজন হয় ৫০-১০০ গ্রাম। এছাড়া বর্ষার সময় জল ধরে চৌবাচ্চার মধ্যেও এই মাছ চাষ করা যায়।

- **পুকুরের পাড়ে হাঁসের চাষঃ** ড. মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, পুকুরের কোন এক প্রান্তে, অল্প খরচে হাঁসের ঘর বানাতে হবে। হাঁসের ঘরটি এমন ভাবে বানাতে হবে, যাতে হাঁসের পায়খানা সরাসরি পুকুরের জলে পড়ে এবং মাছের খাবার হয়। এছাড়া হাঁস জলে চরলে, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণও বাড়ে এবং মাছের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

- **ছোটো মাছকে পাখির হাত থেকে বাঁচানোর উপায়ঃ** ছোটো মাছকে পাখীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, পুকুরের ওপর লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলি সাদা সুতো টানটান করে বাঁধার কথা বলেছেন।

- **পুকুরে পাতা পড়লে পরিচর্যা করার উপায়ঃ** ড. মুখোপাধ্যায় বলেন, ভেসে থাকা পাতাগুলিকে খড় দিয়ে শক্ত রশি বানিয়ে পুকুরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে টেনে এনে বেঁধে দিতে হবে। এরপর ওই জায়গা থেকে পাতাগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে। এই সময় যদি কিছু পাতা পুকুরের তলায় পড়েও যায়, তবে এমন কিছু অসুবিধা হবে না। কিছুদিন জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে, তাই মাছ বাঁচাতে জলের ফোয়ারা করতে হবে। এরপর এগুলি পচে পুকুরের তলায় পাঁকের সাথে মিশে যাবে এবং আর কোন সমস্যা থাকবে না।

- **পুকুর অযত্নে অথবা পাতা পচে নষ্ট হলে মাছ বাঁচানোর উপায়ঃ** প্রতাপবাবু এও বলেন যে, যখন পাতা পচে কিম্বা অন্য কোন কারনে জলের অম্লত্ব বেড়ে যায়, তখন চাষির উচিত পুকুরের বিশেষ পরিচর্যা করা। প্রথমে একটা বড় কাঠে গঁজাল পেরেক গেঁথে হররা বানিয়ে তাকে দড়ি দিয়ে পুকুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি টানতে হবে, এরফলে পাঁকে আঁচড় পড়বে, মিথেন গ্যাস বেরিয়ে যাবে, এরপর কাঠা প্রতি ১ কেজি হিসাবে চুন ছড়াতে হবে। এই চুন, ছড়ানোর আগেরদিন রাতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

- **লবণ কাটাতে অ্যাজোলা চাষঃ** প্রতাপবাবু পুকুরের লবণ কমাতে সেখানে অ্যাজোলা চাষ করার কথা বলেছেন। এছাড়া মাটিতে ছোটো টোপ কেটে কিম্বা মাটির ছোটো ভ্যাটেও অ্যাজোলা চাষ করা যায় বলে জানিয়েছেন। অ্যাজোলা শুধু মাছের আহার নয়, গৃহপালিত পশুপাখির খাবার ও চাষের কাজে সার হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে।

বাদাবনঃ

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা রায় বলেন, ঝড়ের দাপটে বাদাবনের যত না ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় মানুষের কীর্তিকলাপের জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি-র বোটানির এই অধ্যাপিকা শুধু পঠনপাঠনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং কেন্দ্র সরকারের প্রোজেক্ট হাতে পেয়ে সুন্দরবনের ক্ষয়িষ্ণু এলাকায় বাদাবনের সৃজনও করেছেন।

- **রামগঙ্গায় বাদাবন সৃষ্টির অভিজ্ঞতাঃ**

২০১৪ সালে, তাঁরা কেন্দ্র সরকারের একটা প্রোজেক্ট পেয়েছিলেন পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা পঞ্চায়েতের কিছু অংশ যেখানে বাদাবন শূন্য হয়ে যাওয়ায় নদীর পাড়ের দুরাবস্থা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে বাদাবন ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি ছবি দেখিয়ে ও আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন, কীভাবে তাঁরা এখানকার প্রায় ২ হেক্টর এলাকায় লবণাম্বু উদ্ভিদ রোপণের মাধ্যমে বাদাবন শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন।

প্রথমে তাঁরা সেই জায়গায় ধানি ঘাস চাষ করেন, যেটি লবণ সহনশীল এবং যার মূল মাটি ধরে রাখার উপযোগী। এরপর তাঁরা ওই জায়গার উপযোগী কিছু লবণাম্বু প্রজাতির গাছের নার্সারি করেন। এরমধ্যে ছিল কিছু সাধারণ প্রজাতি যেমন কাঁকড়া, বানি, গর্জন, গরান, গেঁওয়া ইত্যাদি এবং কিছু হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি যেমন হেঁতাল, ধুদুল, কালিলতা, সুন্দরি ইত্যাদি।

এই চারাগুলি লাগানোর পর, বাঁচানোর জন্য পঞ্চায়েতের সাহায্য নিতে হয়েছিল এবং ওখানকার আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা মিনধরে, তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল।

- **উক্ত বাদাবনের ওপর আমফান ঝড়ের প্রভাবঃ**

অধ্যাপিকা রায় আরও বলেন, আমফান ঝড়ে এই বাদাবনের গাছগুলি কিন্তু উপড়ে পড়েনি, কোথাও এদের পাতাগুলি ঝরে গিয়েছিল, কোথাও বা পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছিল। আর এগুলি সবই ছিল সাময়িক প্রভাব, কারণ বর্ষা পড়ার সাথে সাথে আবার নতুন পাতা গজাতে শুরু করেছে।

- **নদী বাঁধ বাঁচাতে বাদাবনের ভূমিকাঃ**

ড. রায় এও বলেন, যেখানে তাঁরা বাদাবন তৈরি করেছিলেন, সেই জায়গাগুলির নদী বাঁধ ভালো আছে। অন্যদিকে, যেখানে বাদাবন নেই, সেখানে নদী বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাই তিনি শক্তপোক্ত নদী বাঁধ তৈরির সাথে সাথে, ওই বাঁধের সামনে কিছুটা এলাকা বাদাবন তৈরির জন্য ছাড়ার প্রস্তাব রাখেন, কারণ, বাদাবনই পারবে পরবর্তী কালে ওই বাঁধকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। পৃথিবীর বিখ্যাত লবণাম্বু উদ্ভিদ গবেষকদের মতামত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ধরনের লবণাম্বু প্রজাতির গাছ একই জায়গায় লাগাতে হবে, তবেই ওই বাদাবন সুস্থায়ী হবে।

- **সুন্দরবন রক্ষায় বাদাবনের ভূমিকাঃ**

তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সুন্দরবনবাসীর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতাকে বাদাবন রক্ষার প্রধান বাধা হিসাবে উল্লেখ করেন। আর বাদাবন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও হারিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি বলেন, বাদাবন বাঁচাতে না পারলে অদুর ভবিষ্যতে অনেক মাছ ও সুন্দরবনের অনেক প্রজাতি হারিয়ে যাবে। যদি আমরা লোকালয়ের কাছাকাছি বাদাবন সৃষ্টি করতে পারি, মানুষকে বনসম্পদ আহরণের জন্য গভীর জঙ্গলে যেতে হবে না, ফলে বন্য জন্তুর আক্রমন কমবে। নদীতে মাছের সংখ্যা বাড়বে। মধু, মাছ ইত্যাদি আহরণের জন্য মানুষের কষ্ট লাঘব হবে এবং বাস্তুতন্ত্র ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচবে। এছাড়া জোয়ার ভাটার মধ্যবর্তী এলাকায় (inter-tidal zone) পলি জমা হয় এবং উপকূল ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচে। তিনি বলেন, বাদাবন রক্ষা তখনই সম্ভব, যখন এলাকার লোকেরা নিজে থেকে বীজ সংগ্রহ করবে, গাছ লাগাবে এবং সেগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

- **বিভিন্ন লবণাম্বু উদ্ভিদের লবণ সহিষ্ণুতা ও বীজের সহজলভ্যতাঃ**

ড. রায় আরও বলেন, কাঁকড়া, গর্জন, গরান, বানি, গেঁওয়া ইত্যাদি প্রজাতির গাছ অতিরিক্ত লবণ সহ্য করতে পারে এবং চারাগাছ রোপণের পর এদের বাঁচার হার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ। অন্যদিকে সুন্দরির লবণ সহিষ্ণুতা এবং বৃদ্ধির হার দুই-ই কম। বিভিন্ন কারনে হেঁতাল, গোলপাতা, সুন্দরি ইত্যাদি গাছ হারিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরির হারিয়ে যাওয়ার কারণ হল, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর ফুল আসার সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, যারফলে পরিপুষ্ট বীজ পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে বেশী লবনাক্ত জলে এটি বাঁচতেই পারে না। হেঁতাল গাছ ছোটো অবস্থাতেই এলাকার লোকেরা কেটে নিয়ে চলে যায় ঝাড়ু বানানোর জন্য, ফলে ফুল আসা অবধি সময় পায় না। আবার গোলপাতার ফলটি সুস্বাদু, তাই লোকেরা একে খেতে কিম্বা বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে চলে যায়, আর বীজ পড়ে গাছ হওয়ার সুযোগ থাকে না। এইসব বিভিন্ন কারনে কাঁকড়া, গর্জন, গরান, বানি, গেঁওয়া ইত্যাদি প্রজাতির গাছের বীজ সহজেই এলাকা থেকে বা বন্যদপ্তর থেকে জোগাড় করা গেলেও হেঁতাল, গোলপাতা, সুন্দরি ইত্যাদির বীজ সহজে পাওয়া যায় না।

- **খাড়া নদী বাঁধে লবণাম্বু উদ্ভিদ রোপণের উপায়ঃ**

অধ্যাপিকা রায় বলেন, খাড়া পাড়ে গাছ লাগালে ভাটার টানে, গাছটিকেও ধুয়ে নিয়ে চলে যায়। এর সমাধান হল, লোহার তারের খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে মাটি দিয়ে গাছ লাগানো। কিছু মাটি ভাটার টানে ধুয়ে গেলেও পুরো খাঁচা ধুয়ে যাবে না। আর যতদিনে খাঁচা নষ্ট হবে, তার আগেই গাছটি মাটিতে তার শেকড় বিছিয়ে ফেলতে পারবে এবং ওই জায়গায় স্থির হয়ে যাবে। তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেও কেবল ৫০ শতাংশ গাছ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

সরকারী ও অসরকারী সংস্থার মধ্যে যোগাযোগঃ

প্রসারি সংস্থায় কর্মরত সৈকত পাল মহাশয়, প্রথমে সরকারী সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানানোর আগে, এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী যে নদী বাঁধ ভাঙ্গন, তার সম্পর্কে দু-চার কথা বলেন।

- **নদী বাঁধ ভাঙ্গার কারণ ও সমাধানের উপায়ঃ**

তিনি বলেন, নদী বাঁধ ভাঙ্গার মূল কারণ হল, জোয়ারে জল স্ফীতি হওয়ার পর, ভাটার টানে যখন সেই জল নদীর দিকে ফিরে আসে, নিজের সাথে নদী বাঁধের নীচের অংশের মাটি ধুয়ে নিয়ে আসে। ক্রমাগত মাটি ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে, ধীরে ধীরে ওই অংশটি ফাঁকা হয়ে যায় এবং নদী বাঁধটি বসে যায়। এর পর বড় ঝড় আসলে হয় নদী বাঁধ উপচে কিম্বা ভেঙ্গে জল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

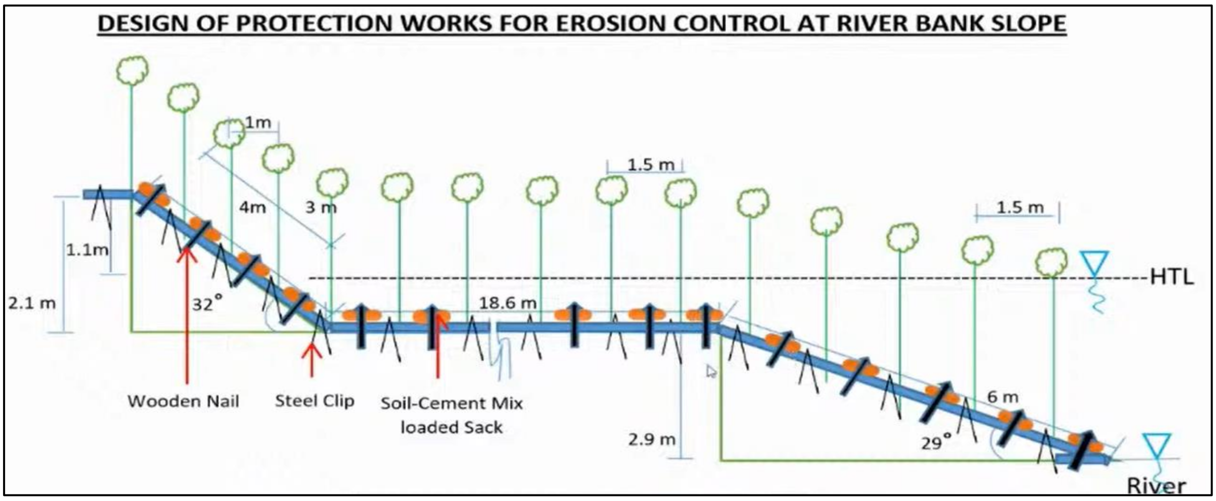

এর সমাধান হিসাবে তিনি দুটি পদ্ধতির কথা বলেন,

- **লবণাম্বু উদ্ভিদ রোপণঃ** নদী বাঁধের সামনে লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগাতে হবে। লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগানোর ক্ষেত্রে, উনি ওই জায়গার জন্য সঠিক লবণ সহনশীল প্রজাতি বাছার কথা বলেছেন।
- **মজবুত নদী বাঁধ তৈরিঃ** নদী বাঁধটি মজবুত করে বানাতে হবে। আর মজবুত বাঁধ করার জন্য, বস্তার মধ্যে সিমেন্ট ও মাটি সঠিক অনুপাতে ভরে স্তরে স্তরে রাখতে বলেছেন আর সেগুলিকে স্থির রাখার জন্য লোহার ক্লিপ ব্যবহার করতে বলেছেন। অন্যদিকে, রাস্তার ওপরে জিও জুট বিছাতে ও তাকে স্থির রাখার জন্য কাঠের প্লাগ ব্যবহার করতে বলেছেন। এটা ভুমিক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করবে। রাস্তার পাশে, জিও জুটের ওপরেই ১.৫ মিটার অন্তর অন্তর লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগাতে হবে। উক্ত মাটির লবনাক্ততা মেপে সঠিক প্রজাতির লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগানোর কথা বলেছেন। এই লবণাম্বু উদ্ভিদও শেকড়ের সাহায্যে মাটি ও জিও জুটকে আটকে রাখবে। যতদিনে জিও জুট মাটির সাথে মিশে যাবে, ততদিনে গাছ বড় হয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে নদী বাঁধ বাঁধার কাজ ওঁরা DRCSC-র সহযোগিতায় এবং সরকারী ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে শুরু করতে চলেছেন সুন্দরবন এলাকায়।

- **বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধাঃ**

✓ **খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার সু**বিধাঃ সৈকতবাবু বলেন রেশনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র পরিবার তার কিছুদিনের খাদ্য সামগ্রী পেতে পারেন। যাঁরা এখন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাছে এই খাবারও কম নয়।

✓ **লবণ সহনশীল বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি পাওয়ার সুবিধাঃ** চাষিরা এই পরিস্থিতিতে লবণ সহনশীল বীজের জন্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক ও ADA এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই একটি দরখাস্থ জমা দিতে হবে।

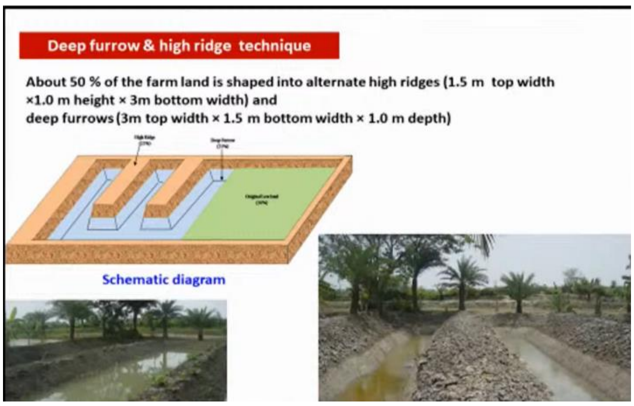

✓ **জলনিকাশি ও উন্নত চাষ ব্যবস্থা গড়ার সুবিধাঃ** তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নোয়ন বিভাগ ১০০ দিনের

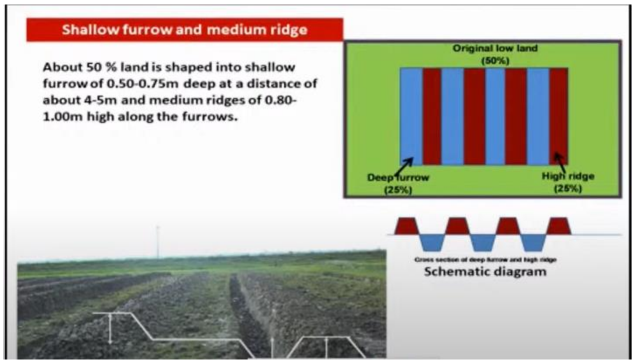

কাজের (MGNREGA) মধ্যে ২৫২ ধরনের কাজের সুপারিশ করেছেন। তাই জলনিকাশি ব্যবস্থা, কেঁচো সার তৈরির পিট বানানো কিম্বা উন্নত চাষ ব্যবস্থা গড়ার জন্য ভূমি খননের কাজে আমরা ১০০ দিনের কাজের সাহায্য নিতে পারি। সেন্ট্রাল সয়েল স্যালিনিটি রিসার্চ (CSSR), সুন্দরবনের লবনাক্ত এলাকায় উন্নত চাষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দুটি মডেল তৈরির সুপারিশ করেছেন। সেগুলির একটি হল 'অগভীর খাদ মাঝারি পাড়' (Shallow Furrow Medium Ridge) ও অন্যটি হল 'গভীর খাদ উঁচু পাড়' (Deep Furrow High

Ridge)। এগুলি একজন চাষি নিজের জন্য আলাদা ভাবে পেতে পারেন IBS (Individual Beneficiary Scheme) এর মাধ্যমে। এছাড়াও তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যায়, তবে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে যেখানে পুকুর খনন করা হল, তাতে মৎস দপ্তর থেকে মাছের চারা নিয়ে ছাড়া যাবে এবং কৃষি দপ্তর থেকে বীজ নিয়ে পাড়ে চাষ করা যাবে।

- ✓ **Five-Square মডেল গড়ার সুবিধাঃ**

২০১১ সালে, প্রসারির কাজের এলাকায় তাঁরা জমির লবনাক্ততা কমানোর জন্য একটি নতুন মডেল তৈরি করেন। এর নাম দেন Five Square মডেল। এই মডেল জমির ঢাল দেখে বানানো হয়। জমির সবচেয়ে নিচু অংশে, মোট জমির ২০ শতাংশ এলাকা জুড়ে একটি পুকুর খনন করা হয়। যেমন ১ বিঘা জমির জন্য ৫৫ ফুট X ৫৫ ফুট ক্ষেত্রফলের একটি পুকুর বানাতে হবে। আর পুরো জমির নতি এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে ওপরের জমির লবণ ধুয়ে এসে পুকুরের জলে পড়ে। জমির ঢাল তৈরির পরিকল্পনা সবচেয়ে নিচু এলাকা থেকে শুরু করে ওপরের দিক অবধি করা উচিত। বাঁধ বানানোর কাজও নিচের দিক থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে যাবে। কোন্ এলাকা থেকে মাটি উঠবে ও কোথায় বাঁধ দেওয়া হবে, জমির নতি ঠিক করা ইত্যাদি সকল কাজ তিনি চাষিকে ঠিক করতে বলেন ও তারপর এই কাজের জন্য ১০০ দিনের কাজের সহায়তা নিতে বলেন।

- ✓ **সামাজিক বনসৃজনের সুবিধাঃ** DRCSC রামগঙ্গার কর্মী দেবব্রতবাবু প্রশ্ন করেন, আইলা ঝড়ের পরে ওনাদের এলাকায় কিছু শক্তপোক্ত নতুন বাঁধ হয়েছে, যেগুলিতে গাছ লাগাতে গিয়ে সরকারী বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এক্ষেত্রে কি করা যায়? এর উত্তরে, সৈকতবাবু বলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে সহযোগিতা চাইলে ফল পাওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য অভিজ্ঞতাঃ

✓ BTS সংস্থার কর্মী সুশান্তবাবু লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগানোর অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, কুলতলির মইপিঠ গ্রামপঞ্চায়েতের ডগেরবাদ এলাকার স্থানীয় লোকেদের বুঝিয়ে প্রথমে দল গড়েন, তারপর ওঁদের দিয়েই বীজ সংগ্রহ, গাছ লাগানো ও গাছ বাঁচানোর কাজগুলি করেন। এরফলে তীব্র ঝড় আমফানও এই অঞ্চলের নদী বাঁধের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এছাড়াও তাঁরা WWF সংস্থার সহায়তায় অনেকগুলি সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থার মডেল তৈরি করেন।

✓ DRCSC হিঙ্গলগঞ্জের কর্মী তপনবাবু জানান তাঁরা কীভাবে স্থানীয় মানুষ ও পঞ্চায়েতের সহায়তায় গ্রামে সামাজিক বনসৃজন ও নদীর পাড়ে লবণাম্বু উদ্ভিদ লাগিয়েছেন। এছাড়াও মিশ্রচাষ ও সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা, এই আমফান ঝড়ে ওখানকার কিছু চাষিকে পূর্ণ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বলে তিনি দাবী করেন। তিনি বলেন, যাঁরা একই বাগানে মুরগী ও সব্জির চাষ করেছিলেন, সব্জি নষ্ট হয়ে গেলেও মুরগী থেকে কিছু আয় পেয়েছেন। আবার যাঁরা বিভিন্ন ধরনের সব্জি লাগিয়েছিলেন, কিছু সব্জি নষ্ট হলেও অন্য সব্জি থেকে আয় পেয়েছেন।

✓ এরসঙ্গে DRCSC কলকাতার কর্মী সুব্রতবাবু যোগ করেন যে, ২০০০ সালের পরে DRCSC যে সুসমন্বিত চাষব্যবস্থার মডেলগুলি তৈরি করেছে, সেগুলি আমফানের পরেও টিকে আছে।

✓ DRCSC জি-প্লটের কর্মী অনিমেশবাবু জানান যে, জি-প্লটের যে অঞ্চলগুলিতে জলনিকাশি ব্যবস্থা ভালো আছে, সেখানে বৃষ্টির জলে জমির লবণ ধুয়ে গিয়ে জমি চাষের উপযোগী হয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে জলনিকাশি ব্যবস্থা এত ভালো নেই, সেখানে লবণ জল এখনও জমা আছে এবং চাষবাসও করা যাচ্ছে না।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ

প্রোগ্রামের সঞ্চালক, অংশুমান দাস এবং আয়োজক সংস্থা, DRCSC-র পক্ষ থেকে তাপস মণ্ডল মহাশয় সকল Resource Persons এবং অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই প্রোগ্রামটি শেষ করেন।